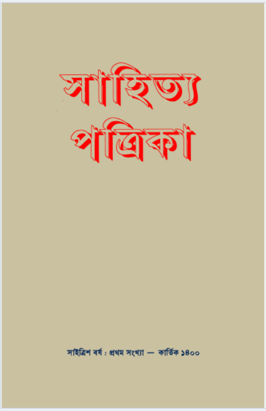

Vol. 37 | No. 1 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আচার্য মুহম্মদ আবদুল হাই

Volume	37
Issue	1
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Humayun Azad
Published online	October 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v37i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i1.1
Pages	9-37
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ১

Check for updates

আচার্য মুহম্মদ আবদুল হাই

হুমায়ুন আজাদ*

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) ছিলেন বাংলাদেশে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক এবং এদেশে বাংলা বিভাগের নতুন কালের স্থপতি। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগদানের পর থেকে আমৃত্যু তিনি এখানেই অধ্যাপনা করেন। আবদুল হাই ছিলেন মূলত লন্ডন ধারার সাংগঠনিক ধ্বনিবিজ্ঞানী, যদিও তিনি কখনো পুরোপুরি আচরণবাদী হয়ে উঠতে পারেন নি। বাংলা ধ্বনিশৃঙ্খলা উদঘাটনে তার অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর পাকিস্তানী আক্রমণকে তিনি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন আপন শক্তি ও যুক্তি দিয়ে। তাঁর সম্পাদনায় দীর্ঘ ১২ বছর (১৯৫৭-৬৯) *সাহিত্য পত্রিকা* প্রকাশিত হয়েছিল।

* প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের নামের সাথে মনীষী বা আচার্য অভিধা ব্যবহার রীতি হয়ে ওঠে নি, যদিও আজকাল নিয়মিত অপব্যবহার করছি আমরা এসব অভিধা; তবে মনীষাবিরল বাঙলায় যে-কজনের নামের সাথে মনীষী বা আচার্য ব্যবহার অতিশয়োক্তি ব'লে গণ্য হবে না, মুহম্মদ আবদুল হাই সে-মুষ্টিমেয়র একজন। অকালে, মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে, বেদনাদায়ক অপমৃত্যু যদি তাঁকে সরিয়ে না নিতো, আর নিজেকে যদি তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন একাত্তরের ঘাতকদের থেকে, তাহলে আজো আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি অস্বাভাবিক হতো না। তিনি নিজে যতি টেনে দিয়েছিলেন নিজের জীবনের। ১৯৬৯-এর জুনের ৩ তারিখের বৃষ্টিভেজা ভোরে করুণ এক দুর্ঘটনার শিকার হয় বাঙলা ভাষা, রেলগাড়ির চাকায় খণ্ডিত হয়ে লোকান্তরিত হন ধ্বনিবিজ্ঞানাচার্য মুহম্মদ আবদুল হাই। বাঙলা ভাষাসাহিত্যের ইতিহাসে দুটি দুর্ঘটনা, একটি ট্রাম ও একটি রেল, বেশ রহস্যময় হয়ে আছে, তবে দুটিই স্বেচ্ছাদুর্ঘটনা; জীবনানন্দ দাশের মতো মুহম্মদ আবদুল হাইও বেঁছে নিয়েছিলেন স্বেচ্ছামৃত্যু, যদিও সামাজিক আমরা তা স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করি। মুহম্মদ আবদুল হাই যে-জীবন যাপন করতেন, তাতে তাঁর কমলাপুর রেলস্টেশনের উত্তরে খিলগাঁও যাওয়ার কথা নয়, ওখানে ওই বৃষ্টিতে তাঁর কোনো কাজ থাকতে পারে না; তিনি গিয়েছিলেন একটি চরম কাজ সম্পন্ন করার জন্যে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে থেকে চাপা অভিমান ও অপমানবোধের মধ্যে বাস করছিলেন তিনি, ছিলেন বিব্রত বিচলিত; কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ দেশে ফিরে এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, এবং ফেরার অল্প পরেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন জীবনকে। পঞ্চাশ বছর বয়সেই তিনি যে-কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, তা তাঁকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে দীর্ঘকাল; তবে বেঁচে থাকলে তিনি আরো মূল্যবান কাজ সম্পন্ন করতে পারতেন, বাঙলা ধ্বনিশৃঙ্খলা হয়তো আরো বিস্তৃতভাবে উদঘাটিত হতো। মুহম্মদ আবদুল হাইকে আচার্যরূপেই দেখতে আমি পছন্দ করি; তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, সুতরাং বাঙলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের, বাঙলা বিভাগের নতুন কালের স্থপতি, এবং তিনি বাঙলাদেশে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক।

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মতো মানুষ আজকাল দেখি না। এমন কাউকে দেখি না, যাঁকে দেখলে মনে পড়ে সংস্কৃতি, রুচি, ব্যক্তিত্বের কথা; সকলকেই মনে হয় খুব বেশি সাধারণ ও বাস্তব। মুহম্মদ আবদুল হাইকে দেখলে মনে হতো তিনি যেনো বাস্তব নন, যেনো চারপাশের কলুষের তিনি কেউ নন। অমন স্মিত হাসি ও শান্ত কণ্ঠস্বর তখনই দুর্লভ হয়ে উঠেছিলো বাঙলায়, আজ তো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। তাঁর পুরো নাম ছিলো আবুল বাশার মুহম্মদ আবদুল হাই, তবে আবুল বাশারটুকু তিনি ব্যবহার

করতেন না। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর থানার মরিচা গ্রামে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বরে। তাঁর পিতার নাম আবদুল গণি, মায়ের নাম ময়মুন্নিসা খাতুন। তাঁর প্রাথমিক পাঠ শুরু হয়েছিলো বাড়িতে, পরে ভর্তি হন মরিচা গ্রামের কাছাকাছি বর্ধনপুর জুনিয়র মাদ্রাসায়। ১৯৩২-এ তিনি ভর্তি হন রাজশাহী হাই মাদ্রাসায়। ১৯৩৬-এ উচ্চ মাদ্রাসা পরীক্ষায় (প্রবেশিকা) প্রথম বিভাগে পঞ্চম হয়ে ভর্তি হন ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট মহাবিদ্যালয়ে। ১৯৩৮-এ আইএ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ষষ্ঠ হন। তাঁর শিক্ষার ভিত্তিটা ছিলো ধর্মীয়, কিন্তু তিনি ওই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলায় বিএ (অনার্স) শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৪১-এ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়ে বিএ (অনার্স) পাশ করেন ও ১৯৪২-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাশ করেন এমএ। তিনিই প্রথম মুসলমান ছাত্র, যিনি বাঙলায় বিএ (অনার্স) ও এমএতে প্রথম শ্রেণী লাভ করেন।

বাঙালি মুসলমানের বাঙালি হওয়ার ইতিহাসে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেকালের মুসলমান সমাজের রীতি অনুসারে বিয়ে করেছিলেন তিনি অল্প বয়সেই, ১৯৩৬-এর ২৮ ডিসেম্বরে, মাত্র সতেরো বছর বয়সে; তাঁর স্ত্রীর নাম আনিসা বেগম। পাশ করার পর তিনি ঢাকা সরকারি মহাবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মহাবিদ্যালয় ও কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন; এবং পাকিস্তান হওয়ার পর ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭-এ চ'লে আসেন রাজশাহী মহাবিদ্যালয়ে। ২ মার্চ ১৯৪৯-এ তিনি প্রভাষকরূপে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে। পরের বছর, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫০-এ, ধ্বনিবিজ্ঞান পড়ার জন্যে তিনি বিলেত যান, ভর্তি হন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং ডিস্টিংশনসহ এমএ পাশ করেন। ১৯৫৩ সালে দেশে ফেরেন। সেকালের মানদণ্ডে তাঁর পদোন্নতিও হয়েছিলো বেশ দ্রুত; ১৯৫৪ সালে তিনি হন রিডার বা সহযোগী অধ্যাপক, এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যেখানে প্রফেসর হ'তে পারেন নি, অবসর নিয়েছিলেন রিডাররূপে, সেখানে তেতাল্লিশ বছর বয়সে, ১৯৬২তে, মুহম্মদ আবদুল হাই হন প্রফেসর। ১৯৫৪ সালের ১৬ নভেম্বর তিনি হন বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ, যে-পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন লোকান্তরিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের পিএইচডি ডিগ্রি ছিলো না, তিনি ডক্টর ছিলেন না। যদিও তিনি অনেক ডক্টর সৃষ্টি করেছেন, তবু নিজের ডক্টরেট উপাধিটি ছিলো না ব'লে একটু অভাববোধ তাঁর ছিলো। ১৯৬৪ সালে *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* প্রকাশের পর তিনি বইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিলিট উপাধির জন্যে পেশ করার কথা ভেবেছিলেন, পুত্রকন্যাদের ও কোনো কোনো বন্ধুর কাছে প্রকাশও করেছিলেন নিজের অভিলাষের কথা। বন্ধুরাই তাঁর ডিলিট হওয়ার পথ

চমৎকারভাবে বন্ধ ক'রে দেন। ১৯৬৪-র আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট ডিগ্রির নিয়ম ছিলো :

> A candidate for the degree of Doctor of Literature (D. Litt.) must have previously obtained the degree of Masters of Arts or the degree of Doctor of Philosophy...[*University of Dacca, The Calender,* Vol I, 1953 : 182].

বন্ধুদের কাছে অভিলাষ ব্যক্ত করার কিছু দিন পর শক্তিশালী বন্ধুরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাঁরা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের প্রস্তাব তুলে ডিলিট ডিগ্রির নিয়ম বদলে দেন :

> The degree of Doctor of Literature (D.Litt.) may be conferred upon a person who has obtained the Ph. D. degree of this University or any other equivalent degree of an approved University...[*University of Dacca Calender* 1969 : 214].

তাই তাঁর আর ডক্টর হওয়া হয়নি। তাঁর এক কীর্তি *সাহিত্য পত্রিকা,* ১৩৬৪ সালে তিনি এটি সম্পাদনা শুরু করেন, বারো বছর ধ'রে সম্পাদনা ক'রে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন একটি অসাধারণ গবেষণাপত্রিকারূপে, তাঁর সম্পাদনাকালে যা ছিলো বাঙলা ভাষাঞ্চলে অদ্বিতীয়। ৩ জুন ১৯৬৯ সালে জীবন থেকে স্বেচ্ছায় অনুপস্থিত হয়ে যান আচার্য মুহম্মদ আবদুল হাই।

মুহম্মদ আবদুল হাই বাঙলাদেশে সূচনা করেছিলেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের। তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান যখন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিলো, এর আর কোনো সম্ভাবনা ছিলো না এদেশে, যদিও এখনো অশেষ সম্ভাবনা রয়েছে; তখন, পঞ্চাশের দশকের শুরুতে, আকস্মিকভাবেই, তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন ধ্বনিবিজ্ঞান পড়তে। তিনি বলেছেন, 'ধ্বনিবিজ্ঞানে যে একদিন দীক্ষা নেবো, এমন কথা ঘুণাক্ষরেও মনে পড়েনি' [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫৯ : ১৫৭]। আকস্মিকভাবে দীক্ষিত হ'লেও তাঁর দীক্ষা ছিলো অবিচল। তিনি তাঁর বিদ্যাকে সকলের কাছে মর্যাদাসম্পন্ন ক'রে তুলতে পেরেছিলেন। তিনি ধ্বনিবিজ্ঞানী হয়েছিলেন, কেননা তখন ধ্বনিবিজ্ঞান ছিলো অনেকটা ভাষাবিজ্ঞান; একদশক পরে বিলেতে গেলে তিনি হয়তো হতেন

বাক্যবিজ্ঞানী। *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* (১৯৫৯) নামে তাঁর আকর্ষণীয় ও বিভ্রান্তিকর নামের যে-বইটি রয়েছে, তাতে ছাপা হয়েছে তাঁর প্রথম জীবনের অধিকাংশ লেখা, ওই লেখাগুলো থেকে বোঝা যায় মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ঝোঁক ছিলো রম্যরচনার প্রতি, যাতে তিনি অনুসরণ করার চেষ্টা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীকে, এবং সৌন্দর্যতৃষ্ণাও ছিলো তাঁর প্রবল। এ-রম্যতা ও সৌন্দর্যতৃষ্ণাকে দমন ক'রে তিনি পাণ্ডিত্যধর্মী প্রবন্ধ লেখায় ক্রমশ মন দেন, বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে ওসব প্রবন্ধ লেখা জরুরি হয়ে ওঠে তাঁর জন্যে। তবে ওই সব অধ্যাপকী প্রবন্ধে তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন আরো পরে, যখন তিনি আকস্মিকভাবে ধ্বনিবিজ্ঞান পড়তে যান বিলেতে। ধ্বনিবিজ্ঞানই তাঁর নিজস্ব এলাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রথম প্রকাশিত বই, *ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান* (১৯৪৯), একটি অনুবাদগ্রন্থ, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের *The Historical Role of Islam*-এর বাঙলারূপ। তিনি বলেছেন :

> একজন শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যতটা অভিজ্ঞ, একজন শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর তার প্রতিবেশী মুসলমানের জীবন সম্বন্ধে ততটা অভিজ্ঞতা থাকা তো দূরের কথা, সামান্যতম ধারণাও নেই। অথচ পরস্পরকে জানলে ও পরস্পরের সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হলে বর্তমান সাম্প্রদায়িক মাথা ভাঙাভাঙির দিনে এ সমস্যার যে অনেকটা নিরসন হয় একথা খুবই সত্য। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে শ্রীযুত রায়ের কাছে [illegible]র *The Historical Role of Islam* বইটির অনুবাদের অনুমতি প্রার্থনা করি।

মুসলমানিত্বের অহমিকা বা পাকিস্তানবাদ প্রচারের জন্যে তিনি ইসলামবিষয়ক একটি বই বেছে নেন নি অনুবাদের জন্যে, অমন উদ্দেশ্য থাকলে তিনি কোনো গোঁড়া মুসলমানের লেখা বই বেছে নিতেন; তিনি নিয়েছেন একজন বিজ্ঞানমনস্ক হিন্দুর লেখা বই, যিনি ইসলামের অবদান উদঘাটন করেছেন কিন্তু তার ঐশিতা স্বীকার করেন নি। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মুক্ত মনের পরিচয় বহন করছে এ-অনুবাদটি। তাঁর সাহিত্য ও ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধের বই দুটি: *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (১৯৫৪, ১৯[illegible]) ও *ভাষা ও সাহিত্য* (১৯৬০, ১৩৭০), এবং রয়েছে একটি রম্য-ব্যক্তিগত ও ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধের বই: *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* (১৯৫৯)। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলো অধ্যাপকী রীতির প্রবন্ধ। তিনি

সৈয়দ সুলতান, আলাওল, লালন ফকির, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, কায়কোবাদ, গিরিশ ঘোষ প্রমুখের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন, অধিকাংশ প্রবন্ধই সংক্ষিপ্ত; এসব প্রবন্ধে তিনি কোনো মৌলিক প্রস্তাব পেশ করেননি, তাঁর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণও বেশ সাধারণ। অনেক প্রবন্ধ তিনি অনুপ্রাণিত না হয়ে হয়তো লিখেছিলেন নানা অনুরোধে। ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে বিকশিত হয়েছে তাঁর সীমিত নিজস্বতা। এ-বই তিনটিতে রয়েছে ভাষাবিষয়ক তেরোটি প্রবন্ধ, যেগুলোতে তিনি ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও প্রণালিগত জটিলতা এড়িয়ে নির্দেশ করেছেন ভাষার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য, বিশেষ ক'রে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* বইটির নামটি বিভ্রান্তিকর; নাম শুনে মনে হয় বইটিতে সম্ভবত রয়েছে ভাষার সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, কিন্তু তা নেই। দুটি প্রবন্ধে তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষার রূপ তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন খণ্ডিতভাবে। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ছিলো, তবে তিনি তাঁর এ-প্রবণতাটির বিকাশ ঘটান নি। তাঁর রম্য-ব্যক্তিগত রচনার একটি রূপ হচ্ছে ভ্রমণকাহিনী *বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন* (১৯৫৮)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও তিনি লিখেছেন, যদিও সাহিত্যের ঐতিহাসিক হওয়ার প্রবণতা তাঁর ছিলো না। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (১৯৫৬) তিনি লিখেছিলেন সৈয়দ আলী আহসানের সহযোগে-পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী। তাঁরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লিখেছিলেন, মৌলিকভাবে নয়, অন্যদের গবেষণার ওপর নির্ভর ক'রে; মুসলমান লেখকদের ওপর দিয়েছিলেন অধিকতর গুরুত্ব, এবং এমন একটি বই তাঁরা প্রস্তুত করেছিলেন যা শিক্ষার্থীদের উপকারে এসেছে। এসব গৌণ পরিচয় বহন করে মুহম্মদ আবদুলর হাইয়ের; তাঁর মুখ্য পরিচয় বহন করে তাঁর ধ্বনিতাত্ত্বিক রচনাসমূহ।

মুহম্মদ আবদুল হাই ছিলেন লন্ডন ধারার সাংগঠনিক ধ্বনিবিজ্ঞানী, নিষ্ঠার সাথে তিনি অনুসরণ করেছেন ওই ধারাকে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষ তাত্ত্বিক উৎসাহ ছিলো না, লন্ডন ধারার তত্ত্বে উৎসাহ ছিলো না একেবারেই, ওই ধারার সম্পূর্ণ উৎসাহ ছিলো বর্ণনায়; তা মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ধ্বনিবিজ্ঞানবিষয়ক রচনায়ও দেখা যায়। তিনি ছিলেন নিপুণ বর্ণনাকারী, যার পরিচয় পাই *A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali* (১৯৬০) ও *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* (১৯৬৪) গ্রন্থে। ডব্লিউ জে বলের সহযোগিতায় তিনি *The Sound Structures of English and Bengali* (১৯৬১) নামে যে-বইটি লিখেছিলেন, তাতেও বর্ণনাই মুখ্য। তাঁর বিলেতে

ধ্বনিবিজ্ঞান পড়তে যাওয়ার অনেক আগেই লিওনার্ড ব্লুমফিল্ডের প্রবল প্রয়াসে আচরণবাদী মনোবিজ্ঞান প্রবেশ করেছিলো ভাষাবিজ্ঞানে, যুক্তরাষ্ট্রে তা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করেছিলো; যদিও লন্ডন বিদ্যালয়ীরা অতোটা উগ্র ছিলেন না, তবুও তাঁরাও ছিলেন আচরণবাদীই। আচরণবাদীদের মতে ভাষা মানুষের নানা আচরণের মতো একটি আচরণ মাত্র, মানুষ আর ভাষা সৃষ্টিশীল নয়। লন্ডনে গিয়ে তিনি আচরণবাদের মুখোমুখি প্রথম বিব্রত বোধ করেছেন; বলেছেন,

> ভাষা সম্বন্ধে এ চিন্তা পদ্ধতির পক্ষে প্রথম বছরখানেক আমার মন কিছুতেই সাড়া দেয়নি। তারপর যতই পড়েছি ও ভেবেছি ততই দেখি এ চিন্তা পদ্ধতিও একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভাষাকে সমাজ জীবনের ভিত্তি রচনার মূল সহায় হিসেবে ধরলে এ চিন্তা পদ্ধতির একটা সহজ মীমাংসা পাওয়া যায় [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ১১-১২]।

তিনি এ-মত মেনে নিয়েছিলেন, না মেনে উপায় ছিলো না; তবে তিনি ধ্বনিবিজ্ঞানী ছিলেন ব'লে আচরণবাদ তাঁকে বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি, কারণ আচরণবাদ ধ্বনিবর্ণনায় কোনো কাজে লাগে না। তিনি মনে করেছেন যে আচরণবাদ 'শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে' আছে, তা অবশ্য ঠিক নয়; আসলে এটা কোনো 'শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে' নেই। তবে তত্ত্ব মুহম্মদ আবদুল হাইকে বেশি আকর্ষণ করে নি; ভাষা কী এ-সম্পর্কে কোনো তত্ত্ব পোষণ না ক'রেও সাংগঠনিক রীতিতে ধ্বনিবর্ণনা সম্ভব, তিনিও তাই করেছেন। ভাষা বলতে তিনি বুঝেছেন :

> যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ সমাজমন সমাজের বহুজন স্বীকৃত কতকগুলো অর্থবোধক ধ্বনির বা ধ্বনিগত অর্থবোধক সঙ্কেতের সাহায্য সেই সমাজ জীবন চালু রাখে। এই অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টির নামই ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ বিশেষ সমাজ জীবনের জন্য বিশেষ ভাষা [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ৮]।

ভাষার যে-সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন, সাংগঠনিকেরা ঠিক এভাবে দেন না, অর্থকে তাঁরা অবহেলাই করেন; মুহম্মদ আবদুল হাই অর্থের কথা ভুলতে পারেন নি, অর্থাৎ তিনি পুরোপুরি আচরণবাদী হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁরা 'অর্থবোধক ধ্বনি' ব'লে কিছু স্বীকার করেন না, আর ১৯৫৭-পরবর্তী রূপান্তরবাদীরা ভাষাকে ধ্বনিসমষ্টি ব'লেও মনে করেন না। সাংগঠনিকেরা ভাষার সর্বজনীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন না; মুহম্মদ আবদুল হাইও মেনে নিয়েছিলেন যে-

দুনিয়ার সব মানুষেরই সমাজ-মনের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য ভাষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু ভাষার নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে সার্বজনীনতা বলে কিছু নেই। প্রত্যেক ভাষারই নিয়ম-কানুন স্বতন্ত্র। সে দিক থেকে প্রত্যেকটি ভাষাই এক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জগতের মতো আপন কক্ষপথে আপনিই বিচরণ করছে [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ৭২]।

প্রতিটি ভাষার স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে এমন ধারণা প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই দেখা দিতে থাকে, এক সময় তা চমকপ্রদভাবে আকর্ষণীয় ছিলো। সাংগঠনিকেরা বলতেন যে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে একমাত্র সাদৃশ্য হচ্ছে এদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই; ফ্রানৎস বোয়াস আমেরিকার আদিভাষাগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন এ-ধারণা, এবং পরবর্তী সাংগঠনিকেরা এ-ধারণাটিকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন বৈসাদৃশ্যবাদী, মনে করতেন কোনো মিল নেই ভাষায় ভাষায়। কিন্তু ভাষায় সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের কোনো অভাব নেই, আপাতদৃষ্টিতে একটি ভাষাকে আরেকটি ভাষা থেকে যতোই ভিন্ন ব'লে মনে হোক-না-কেন, মানবভাষার মধ্যে রয়েছে গভীর মিল। মিল রয়েছে ধ্বনিতে, *ক্যাটেগরিতে*, বাক্যসংগঠনে, আর অর্থে। মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডব্লিউ জে বলের লেখা *The Sound Structures of English and Bengali* নামের বইটিই প্রমাণ করে যে ভাষায় ভাষায় পার্থক্য সত্ত্বেও মিল রয়েছে, 'প্রত্যেকটি ভাষাই একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জগতের মতো আপন কক্ষপথে আপনিই বিচরণ করছে' না। তবে তাঁর বিশ্বাস তাঁর বর্ণনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে নি। *A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali* গ্রন্থে পাই একটি বাঙলা ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার নিপুণ জটিল বর্ণনা, যা বুঝতে হ'লে পাঠককে ধ্বনিবিজ্ঞানে দক্ষ হওয়া দরকার। মুহম্মদ আবদুল হাই বুঝেছিলেন এমন বর্ণনা বাঙালির সমাজে বিশেষ উপকারে আসবে না, তাঁর বর্ণনা বোঝার জন্যে কোনো দক্ষ পাঠক তিনি পাবেন না; তাই বর্ণনাকে সহজভাবে পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ বাঙালি পাঠক ও শিক্ষার্থীদের কাছে। সে-কাজ তিনি করেন *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* গ্রন্থে; প্রণালিপদ্ধতিগত জটিলতা পরিহার ক'রে সরলভাবে তিনি বর্ণনা করেন বাঙলা ধ্বনিশৃঙ্খলার খণ্ডাংশ, যা অনেক দিন হয়ে থাকবে বাঙলা ধ্বনিশৃঙ্খলার খণ্ডাংশের শ্রেষ্ঠ বর্ণনা।

মুহম্মদ আবদুল হাই যখন বেঁচেছিলেন তখন বাঙালির ওপর চেপে বসেছিলো পাকিস্তানবাদ, যা লিপ্ত ছিলো বাঙলা ভাষাকে পর্যুদস্ত করার নিরন্তর চক্রান্তে। মুহম্মদ

আবদুল হাই শান্তভাবে প্রতিহত করেছেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর পাকিস্তানবাদী আক্রমণ। তাঁর ভূমিকা ছিলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন, ১৬ নভেম্বর ১৯৫৪ থেকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ; তাই তাঁর ভূমিকা শুধু ব্যক্তিগত ছিলো না, ছিলো প্রাতিষ্ঠানিকও। পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের চাপ নিশ্চয়ই পড়তো তাঁর ওপর, তিনি বিদ্রোহ না ক'রে শান্তভাবে প্রতিহত করেছেন ওইসব চাপ। তাঁর লেখা পরিচয় দেয় যে একজন গভীর বাঙালি বাস করতো তাঁর ভেতরে। তাঁর বিভিন্ন লেখায় ফিরে ফিরে এসেছে 'বাঙালি', 'বাঙলাদেশ' প্রভৃতি শব্দ। তখন বাঙলার ও বাঙালির অবস্থা ছিলো কেমন? তিনি লিখেছেন, 'বাংলার আজ দুর্দিন। সকল বাঙালীরই। যাদের নয় তারা ত সমাজের পরগাছা' ['মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫৯ : ৪] বা 'তেমনি আসে অভাব ও দৈন্য পীড়িত বাঙালী মুসলমানের এই জিন্দেগীর ঈদ' [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫৯ : ৩৮]। জিন্না সম্পর্কে লিখতে গিয়েও বলেছেন, 'আমরা এ উপমহাদেশবাসী, শুধু তাই নই — বাঙালী; আবার তাও নই — মুসলমান' [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫৯ : ২০]। একটি ভূখণ্ডকে তিনি বারবার নির্দেশ করেছেন 'বাংলা দেশ' নামে : 'বাংলা দেশ অনুকরণপ্রিয়। ইসলাম প্রবর্তিত মানবতার ও নূতন সমাজ ব্যবস্থার আকর্ষণে বাংলা দেশও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিপুলভাবে সাড়া দিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে বাংলা দেশে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল' [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৬৫ : ৪]। তিনি বাস করছিলেন 'পূর্ব পাকিস্তান'-এ, তবে এ-নামের আড়ালে তিনি বাস করেছেন বাঙলাদেশেই; সম্পূর্ণ পাকিস্তান তাঁর স্বপ্নআবেগকে অধিকার করতে পারে নি। কিশোরদের জন্যে যখন তিনি স্বদেশ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছেন, তখন তার নাম রেখেছেন 'পূর্ব পাকিস্তান', কিন্তু মনের মধ্যে লালন করেছেন বাঙলাকে :

> পূর্ব পাকিস্তান আমার দেশ। আমি এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই দেশের আবহাওয়ায় মানুষ হইতেছি। এই দেশের মাটিতে যে শাক-সব্জী, ফল-মূল এবং আরও নানাপ্রকার খাদ্যশস্য জন্মে, তাহা খাইয়াই আমি জীবনধারণ করিতেছি। [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫৭ : ১]।

১৯৫৭ সালে কিশোরদের জন্যে লেখা এবং তাঁরই সংকলিত বইয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান আমার দেশ' বলা বেশ আপত্তিকর ছিলো। কিন্তু তিনি 'পাকিস্তান আমার দেশ' শেখাতে চান নি কিশোরদের, বলেছেন, 'আমার সেই সোনার পূর্ব-পাকিস্তানকে আমি কি ভালবাসিব না?' [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫৭ : ২]। তখন শেখানোর কথা ছিলো পাকিস্তানকে ভালবাসা, কিন্তু তিনি শিখিয়েছিলেন :

> পূর্ব পাকিস্তানের এই শোভা, এই গান ও এই আনন্দ আমাদের জীবনে আমাদের সাথী হইয়া রহিয়াছে। এমনটি আর কোথায় পাইব ?...শত্রু আমার দেশকে — আমার সেই সোনার জন্মভূমি পূর্ব-পাকিস্তানকে — আক্রমণ করিলে আমি এই দেশের জন্য লড়াই করিয়া শহীদ হইব না তো কোন্ দেশের জন্য হইব ? ধন্য আমার মাতৃভূমি, ধন্য আমার পূর্ব-পাকিস্তান, তোমাকে আমার সালাম জানাই [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫৭ : ৩]।

তিনি কিশোরদের পাকিস্তানের জন্যে শহীদ হ'তে শেখান নি, শিখিয়েছেন 'সোনার জন্মভূমি পূর্ব-পাকিস্তান'-এর অর্থাৎ সোনার বাঙলার জন্যে শহীদ হ'তে। এর সাথে পল্লীকবির রচনাটি মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে কতোটা আন্তরিক বাঙালি ছিলেন তিনি। একই বিষয়ে জসীমউদ্‌দীন লিখেছিলেন : 'আমাদের সুন্দর মাশরেকী পাকিস্তানের মানচিত্রের দিকে একবার চেয়ে দেখুন।...এই ভাষার সাহায্যে আমাদের দেশে অসংখ্য জনগণকে আমরা পাকিস্তানের নতুন আদর্শে উদ্বোধিত করে তুলব। নয়া যামানার ফজরের মেহেদী রঙে আমরা রঙীন হয়ে উঠব' বাঙলার পল্লীকবি পাকিস্তানের রঙে রঙিন হয়ে ভুলে গেছেন বাঙলাকে, তাঁর কাছে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে উঠেছে 'মাশরেকী পাকিস্তান'; তিনি জনগণকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন 'পাকিস্তানের নূতন আদর্শে', রঙিন হ'তে চেয়েছেন 'নয়া যামানার ফজরের মেহেদী রঙে'। বাঙলার পল্লীকবিও যখন মেতে উঠেছিলেন পাকিস্তান ও উর্দুফারসিতে, তখন মুহম্মদ আবদুল হাই থেকেছেন আন্তরিক বাঙালি।

পাকিস্তানবাদের এক মারাত্মক লক্ষ্য ছিলো বাঙলা ভাষার ইসলামিকরণ, যাতে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সম্মতি ছিলো না। তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এ' ক'বছর ধরেই আমাদের সাহিত্যিক, শিক্ষক ও সাংবাদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের সাহিত্যের ভাষা কি হবে সে সম্পর্কে প্রবল আত্মজিজ্ঞাসার সূচনা হয়েছে দেখতে পাই।' [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ১৬]। তিনি দেখেছেন স্বাধীনতা বাঙলা ভাষার দু-অঞ্চলেই কিছুটা ভাষিক বিকৃতি সৃষ্টি করেছে :

> মুসলিম জীবনের সর্ববিধ স্বাধিকারের দাবীতেই পাকিস্তানের জন্ম। ....নূতন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে পশ্চিম বঙ্গের সরকারী ভাষাকমিটি যেমন প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দকে বাদ দিয়ে জাতীয় অভিমানবশতঃ দুর্বোধ্য ও দুরুচ্চারিত সংস্কৃত ব্যবহারের পরওয়ানা জারি করেছে, জনসাধারণের ঘরোয়া ভাষার প্রতি যথোচিত মূল্য দানের বিষয়

> একেবারে ভুলে গেছে, আমাদের এখানেও তেমনি আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে কিছু অতিরেক ও অতিরঞ্জন দেখা গেছে [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ১৮] ।

তিনি পশ্চিম বাঙলার বাঙলা ভাষার হিন্দুকরণ যেমন স্বীকার করেন নি, তেমনি পাকিস্তানে বাঙলা ভাষার ইসলামিকরণও মানেন নি। তিনি বলেছেন, 'ভাষা নানা প্রভাব সহ্য করে কিন্তু জোর জবরদস্তি সহ্য করে না। জোর জুলুম করে অপরিচিত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করলেও ভাষার স্বাভাবিক গতি তাদের যেমন স্বীকার করে না; তেমনি গুরুভার সংস্কৃত শব্দও বাংলা ভাষার গতিপথে টিকলো না' [মুহাম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ২৭]। দু-অঞ্চলের বিকারের রূপই তিনি দেখিয়েছেন :

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরে এ দাবীর উগ্র প্রকাশও আমরা দেখেছি। এখানে পশ্চিম বাংলা ও পাকিস্তান সমানভাবেই একই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। পশ্চিম বাংলাতেও যেমন নিত্যব্যবহার্য ও বহুল প্রচলিত জমিজমা, উকিল-মহুরী, আইন-আদালত জাতীয় আরবী-ফারসী শব্দ বাদ দিয়ে অপরিচিত ও উদ্ভট সংস্কৃত শব্দ আমদানি করা হয়েছে, তেমনি আমাদের এখানেও নিত্যব্যবহার্য ও বহুল পরিচিত সাধারণ বাংলা শব্দের পরিবর্তে 'জমহুরিয়া', 'সদরে রিয়াসত', 'জস্নে আজাদী', 'ঈদ জমিমা', 'আশিয়ানা', 'গোজারেশ', ইত্যাদি অপ্রচলিত এবং সাধারণের আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করার প্রয়াস দেখা গেছে' [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ৩১] ।

তিনি চেয়েছেন রাজনীতিক উগ্রতামুক্ত স্বাভাবিক বাঙলা ভাষা।

আধুনিক কালে বাঙালি সৃষ্টি করেছে দুটি মান বাঙলা ভাষা; — সাধুরীতি ও চলতিরীতি; দুটিই সৃষ্ট হয়েছে কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে। পাকিস্তানবাদীরা একটি পাকিস্তানি মান বাঙলার স্বপ্ন দেখেছিলো, যা ছিলো এক অসম্ভব দুঃস্বপ্ন। মুহম্মদ আবদুল হাই নতুন পাকিস্তানি মান বাঙলায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলেছেন :

> রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষায় গত দেড়শো বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালী সাহিত্যিকই সাহিত্য চর্চা করে এসেছেন।.... এর মূল গঙ্গাপারে হলেও বিগত দেড়শো বছরে শুধু গঙ্গাপারেই এ গ্রথিত থাকে নি, শাখা পল্লব

বিস্তার করে উভয় বাংলারই সাধারণ সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছে।...এ উপভাষার ঐতিহ্যকে আমরা যদি গ্রহণ না করি তা হলে কোন উপভাষায় আমরা সাহিত্য সৃষ্টি করবো ? ঢাকার ?- নোয়াখালীর ?-চট্টগ্রাম ?-শ্রীহট্টের, না ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের ?' [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ৫৮] ।

তিনি জানতেন নতুন মান বাঙলা সৃষ্টি সম্ভব নয়, আর সম্ভব হ'লেও তা শুভ নয়। তিনি বলেছেন :

আমাদের সামনে গত দেড়শো বছরের সাহিত্যের এ ঐতিহ্য যদি না থাকতো তা হলে রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এখানকার কোন এক উপভাষাকে ভিত্তি করে সাহিত্যের একটা ষ্টান্ডার্ড ভাষা গড়ে তুলতে পারতাম। প্রচলিত ষ্টান্ডার্ড ভাষা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না।" [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ৫৯] ।

তিনি গ্রহণ করেছেন প্রচলিত মান ভাষাকেই : 'পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা গদ্যের রূপায়ণে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বহুকাল ধরে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বহু লোকের অনুশীলিত সেই ষ্টান্ডার্ড ডাইলেক্‌টকেই আমাদের সাহিত্যের base তথা মূলভিত্তি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখিনা [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ৬৩] ।

উচ্চারণের ক্ষেত্রেও তাঁর একই সিদ্ধান্ত :

চলিত উচ্চারণকে যাঁরা কলকাতা, শান্তিনিকেতন তথা পশ্চিমবাংলা ভিত্তিক বলে বর্জন করতে চান, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। এ উচ্চারণ পশ্চিম বাংলা ভিত্তিক হলেও প্রাক-আজাদী যুগের বহু জিনিসের মত আমরা এর উত্তরাধিকারী। এই উচ্চারণই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ আদর্শ উচ্চারণ গড়ে তোলার ভিত্তি [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ৭২] ।

বাঙলা ও বাঙালিকে পর্যুদস্ত করার আরেকটি পাকিস্তানবাদী চক্রান্ত ছিলো বাঙলা বর্ণমালার বদলে রোমান বর্ণমালা ব্যবহারের প্রস্তাব। ১৯৫৭ সালেই মুহম্মদ আবদুল হাই বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির সাহায্যে প্রত্যাখ্যান করেন এ-প্রস্তাবকে। তিনি বলেছেন,

'সম্প্রতি রোমান হরফে বাংলা লিখবার একটা ধূয়া উঠেছে, [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ৯৪] ; এতেই তাঁর অসন্তোষ স্পষ্ট ধরা পড়ে। তবে শুধু অসন্তোষ প্রকাশ করলে চলবে না ব'লে তিনি একের পর এক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন প্রস্তাবটির অসারতা।

তখন উগ্র পকিস্তানি বাঙলাপন্থীর অভাব ছিলো না, যাঁরা আজ বাদ দিচ্ছিলো বিদ্যাসাগরকে, কাল বঙ্কিমকে, পরশু রবীন্দ্রনাথকে, এবং সরকারের স্নেহে তৈরি ক'রে চলছিলো মুসলমানি বাঙলা। মুহম্মদ আবদুল হাই সাধারণত বক্তব্য পেশ করেন মৃদুভঙ্গিতে, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ আক্রমণে যান না; কিন্তু তিনিও কখনো কখনো তাঁদের কাজে বিদ্রূপপরায়ণ হয়ে উঠেছেন :

> আমাদের মধ্যে একদল ভাবছেন বাংলা ভাষাকে একেবারে বাদ দিয়ে উর্দুকে বরণ করা যখন সম্ভব হলো না তখন প্রচুর আরবী ফারসী তথা উর্দু শব্দ আমদানি করে, বাংলার বর্ণমালা পর্যন্ত পাল্টে দিয়ে বাংলাকে ধীরে ধীরে উর্দুর সমপর্যায়ে টেনে তুলতে হবে। এঁরা হলেন চরমপন্থী। চরমপন্থীরা মনে করেন বড় রকমের রাজনৈতিক বিবর্তন প্রতি দেশেরই জাতীয় জীবনে একটা পরিবর্তন এনে দেয়। তাই আমরা যখন পাকিস্তান অর্জনে সফলকাম হয়েছি তখন পুর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বাংলাভাষা ও সাহিত্যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তার জন্য আস্ফালনের প্রয়োজন নেই, ভাষাকে আজই ঢেলে সাজাবার তাগিদ নেই আর বর্ণমালাকে গঙ্গা পার করে পশ্চিম বাংলার 'কুফুরস্থানে' ঠেলে দিয়ে হুরুফুল কোরানের ভাঁওতায় উর্দু অক্ষর গ্রহণ করারও 'জরুরাত' নেই। পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্নতির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যেও ধীরে ধীরে পাকিস্তানী (পূর্ব পাকিস্তানী অবশ্য) ছাপ বহন করবে [মুহাম্মদ আবদুল হাই ১৯৬৫ : ১৯২-১৯৩] ।

'বর্ণমালাকে গঙ্গা পার করে পশ্চিম বাংলার 'কুফুরস্থানে' ঠেলে দিয়ে হুরুফুল কোরানের ভাঁওতায় উর্দু অক্ষর গ্রহণ করারও 'জরুরাত' নেই'- কথাগুলো লক্ষ্য করার মতো। এমন বিদ্রূপ তিনি আরেকবার করেছেন : 'কথা উঠেছে সাহিত্যকেও দীন ইসলামের কলেমা পড়াতে হবে।...পৃথিবীকে শারীরিক শক্তির আস্ফালনের দ্বারা কোন জাতি বাঁচেনি; কুওতে ইসলাম জাহির ক'রে আমরাও তেমন বাঁচতে পারবো না।' [মুহম্মদ আবদুল হাই, ১৯৬৫ : ২০০] । বেশ ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি, 'কথা উঠেছে সাহিত্যকেও দীন ইসলামের কলেমা পড়াতে হবে' বলতে এখন খুবই সাহসের দরকার হবে।

বাঙলা ভাষার পাকিস্তানিকরনের পরিণতিও তিনি নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন :

'এই প্রয়োগ পরীক্ষার বিফলতায় আমাদের জাতির (বাঙালী মুসলিম) মনে গভীর নৈরাশ্য দেখা দেবে। আর রাজনৈতিক অবস্থার জন্যই ভেতরে ভেতরে উর্দুটাও আমাদের গা সওয়া হয়ে উঠবে। তখন একদিন আইনের জোরেই হোক কিংবা মানসিক বিকারের ফলেই হোক উর্দুকে শুধু জীবিকা অর্জনের ভাষা রূপে নয়, আমাদের কথ্য, লেখ্য, শিক্ষার মাধ্যম ও সাহিত্যের ভাষারূপে উৎসব ক'রে বরণ করে নেওয়া হবে। তারপর পূর্ববাংলায় চলবে উর্দুর সাধনা।....আমরা হবো তখন ওদের বোঝা স্বরূপ, হবো অশ্রদ্ধার পাত্র। দু-নৌকায় পা দিয়ে সে অবস্থায় আমাদের বাঁচা তো দূরের কথা, শান্তিতে মরবারও আর ফুরসৎ থাকবে না' [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৬৫ : ১৯৩]।

তাহলে বেঁচে থাকতে হবে কীভাবে ? তিনি বলেছেন, 'আমরা পাকিস্তানবাসী অথচ পূর্ব পাকিস্তানের; এই বৈশিষ্ট্যের উপর যদি আমাদের সাহিত্য গড়ে ওঠে তবে আশা হয় আমরা মরবো না; এবং কারুর দাসেও পরিণত হব না' [মুহাম্মদ আবদুল হাই ১৯৬৫ : ২০১]। পাকিস্তানের সাধনা ছিলো মুসলমান গড়ার, কিন্তু মুহম্মদ আবদুল হাই দেখছিলেন দিকে দিকে গ'ড়ে উঠছে বানর, যে-প্রক্রিয়া আজো চলছে। তিনি বলেছেন, ' সে যে বাঙলার মানুষ। সুতরাং তার মুসলমানত্ব ও বাঙালীত্ব তার পাকিস্তান ও পূর্ব বাঙলা-এই বৈশিষ্ট্যের উপরেই তার সাহিত্য তাকে রচনা করতে হবে' [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৬৫ : ১৯৮]। তিনি চেয়েছেন আধুনিক বাঙালি লেখকও উর্বর করবেন বাঙলার মাটি ও সাহিত্যকে; তা হবে বাঙলার ও বাঙালির, পাকিস্তানের ও পাকিস্তানির নয়। তিনি বলেছেন, 'এখানকার সাহিত্য হবে এখানকার মানুষেরই জীবনের প্রতিচ্ছবি' [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ১৩৫]।

মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কেই সাধারণত প্রবন্ধ লিখেছেন, পাকিস্তানি সমাজের ভাষ্য লেখেন নি। তবে ওই সমাজের চরিত্রহীনতা তাঁর চোখ এড়ায় নি। তিনি দেখেছেন, 'নীতিজ্ঞান ঐতিহাসিক ভাবেই আমাদের দেশ থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আযাদী পরবর্তী যুগে চরিত্রহীনতাই আমাদের এ কালের নীতিজ্ঞান' [মুহাম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ১৮০]। আর ইসলাম ? বলেছেন 'ইসলামকে আজ যে মুসলমানেরাই তাদের নিজেদের স্বার্থের অজুহাতে ব্যবহার

করছে' [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৭০ : ২৪০]। পাকিস্তান যে পরগাছাদের, যেমন আজকের বাঙলাদেশ, তাও তাঁর চোখে পড়েছে; বলেছেন :

এ মাস ও এ দিন পরগাছাদের, কিন্তু সামনের মাস গরীবের। ধনীরা এ মাসে আমোদ করে, এ দিনে খায় আর গরীবেরা এ দিনে উপোস করে, এ মাসে শুকোয় আর সামনের মাসের দিকে চেয়ে থাকে....এ মাস চোরাকারবারে ফেঁপে ওঠা ধনীর সহজ সুখের আশ্রয় বড়ো কন্ট্রাক্টারের সুখ নিদ্রা, আর সুযোগসন্ধানী নরনারীর চকিত থাকা [মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫৯ : ৪-৫]।

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের রচনার পরিমাণ বিপুল নয়। নিচে তার গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত পরিচয় দেয়া হলো।

[১] ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান

মূলঃ এম এন রায়

প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯; রেনেসাঁ পাবলির্শাস, কলকাতা। পৃষ্ঠা ১২+১২৬। দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭; নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। পৃষ্ঠা ১০+১২৫; মূল্য ২.০০।

[২] সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪; বি-এফ্-এইচ্ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৮+১৭২; মূল্য ৩.৫০। উৎসর্গঃ মরহুম ওয়ালেদ জনাব আবদুল গনি-কে। বইটিতে সংকলিত হয় ১৭টি প্রবন্ধ। দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ১৯৬৫; ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা। পৃষ্ঠা ১০+২৫৬; মূল্য ৭.০০। উৎসর্গঃ জান্নাতবাসী আব্বা জনাব আবদুল গনির স্মরণে। এ-সংস্করণে বইটিতে সংকলিত হয় ১৯টি প্রবন্ধ। প্রথম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত 'ভাষা ও সমাজ-জীবন' [পৃ ১-১২], এবং 'রবীন্দ্র কাব্যে মানবতা' [পৃ ৭৩-৮৩] প্রবন্ধ দুটি দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ দেয়া হয়; এবং সংযোজিত হয় চারটি নতুন প্রবন্ধ : 'বিদ্যাপতি কাব্যপাঠ', 'লালন শাহ ফকির', 'আলাওলের সেকান্দারনামা', ও 'ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ'। 'ভাষা ও সমাজ-জীবন' প্রবন্ধটি ভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে গৃহীত হয়, কিন্তু

'রবীন্দ্র-কাব্যে মানবতা' প্রবন্ধটি পরে কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি। প্রবন্ধগুলোর প্রথম প্রকাশের তথ্য :

১৯৪৩ ইসলামে শাসন-সংহতি। *দেশের কথা,* ঈদসংখ্যা, অক্টোবর।
১৩৫২ মুসলিম ভারতে স্ত্রীশিক্ষা। *মাসিক মোহাম্মদী [মামো],* জ্যৈষ্ঠ।
১৩৫২ মুসলিম ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা। *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী,* মাঘ।
১৩৫২ ঐতিহাসিক উপন্যাস। *মামো,* ১৮ঃ১০, ৪৬৬-৪৬৭।
১৩৫২ বাংলা সনেটের পটভূমি। *মামো,* ১৯ঃ২, ১২৮-১৩৩।
১৩৫৩ নজরুল প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। *মিল্লাত,* ঈদসংখ্যা।
১৯৪৮ হিন্দু বাঙলার ধর্মান্দোলন ও উনবিংশ শতাব্দী। *কৃষ্ণনগর শতবার্ষিকী কলেজ ম্যাগাজিন।*
১৩৫৬ আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। *দিলরুবা,* ১ঃ৩, ১৩৫-১৪০।
১৩৫৬ কবিগুরু আলাওল। *ইমরোজ,* ১ঃ৫, ২৮১-২৮৫।
১৩৫৬ মানুষের প্রেম ও কবি আলাওল। *ঢাকা প্রকাশ,* ৮৯ঃ২৯।
১৩৫৬ রবীন্দ্র-কাব্যে মানবতা। *তাহজীব,* ১ঃ৩।
১৯৫০ ইসলামের বৈপ্লবিক ভূমিকা। *মাহে-নও* [মান], নভেম্বর।
১৩৫৭ কবি সৈয়দ সুলতান। *মান,* শ্রাবণ।
১৯৫১ বাঙলা দেশে মুসলিম অধিকারের যুগ ও বাঙলা সাহিত্য। *সংহতি,* মুসলিম হল ম্যাগাজিন; *এলান,* অক্টোবর।
১৯৫৩ ভাষা ও সমাজ-জীবন। *মান,* ৫ঃ৫, ১২-১৭।
১৯৫৪ বাঙলা কাব্যের নতুন ধারা ও নজরুল ['নজরুল সাহিত্যে নূতন ধারা' নামে প্রকাশিত]। *মান,* ৬ঃ২, ১১-১২।
১৩৬৭ বিদ্যাপতি কাব্যপাঠ। *সাহিত্য পত্রিকা [সাপ]* ৪ঃ২, ২৫৫-৩০০।
১৩৬৮ ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ। *সাপ,* ৫ঃ১, ৬৫-৮৮।

[৩] বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

[আধুনিক যুগ]

প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৫৬; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা ৮+৩২৯+শুদ্ধিপত্র ২+নির্ঘণ্ট ৪৩+১; মূল্য ৬.০০। বইটির সহযোগী লেখক সৈয়দ আলী আহসান। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭১ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪; ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা। পৃষ্ঠা

১২+৪৪৭+নির্ঘন্ট ৩৮+শুদ্ধিপত্র ১। এ-সংস্করণে একটি 'মুখবন্ধ' যুক্ত হয়। বইটির তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের লোকান্তরের পর প্রকাশিত। পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৮৫ তে। প্রকাশক আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ ঢাকা । পৃষ্ঠা ১৮+৪৯২। প্রথম সংস্করণে পরিচ্ছেদ ছিলো এগারোটি, দ্বিতীয় সংস্করণেও এগারোটি, তৃতীয় সংস্করণে পরিচ্ছেদের সংখ্যা বারো। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয় বিভাগোত্তর সাহিত্য। বইটির সপ্তম পরিচ্ছেদঃ 'কলিকাতা কেন্দ্রিক নতুন সাহিত্য-জীবন', অষ্টম পরিচ্ছেদঃ 'উনিশ শতকের মহাকাব্যের ধারা', নবম পরিচ্ছেদঃ 'উনিশ শতকের গীতিকাব্য, কাহিনীকাব্য ও বর্ণনামূলক কাব্য', দশম পরিচ্ছেদঃ 'বাংলা নাটকঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', একাদশ পরিচ্ছেদঃ 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলার কাব্য', এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদের 'নাটক' ও 'কাব্য' বিষয়ক অংশ লিখেছেন সৈয়দ আলী আহসান। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই নির্ভরযোগ্য। প্রথম সংস্করণটি ছিলো অসম্পূর্ণ, এবং মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মৃত্যুপরবর্তী সংস্করণগুলো নানাভাবে ক্রটিপূর্ণ ।

[৪] বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৮; নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৪+১৭৬; দাম তিন টাকা। কলেজ সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪; নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১। পৃষ্ঠা ৪+২০৮; মূল্য ৩.০০। উৎসর্গঃ আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের হাতে। কলেজ সংস্করণ ষষ্ঠ মুদ্রণ আগস্ট ১৯৬৯; হাসিন জাহান, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৪+২০৮; মূল্য ৩.০০। কলেজ সংস্করণ সপ্তম মুদ্রণ আগস্ট ১৯৭০; হাসিন জাহান, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৪+২০৮। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র। উৎসর্গঃ আমার পুত্র ও কন্যাদের হাতে। বইটির নাম প্রথম স্থির করেছিলেন *বিলেতের কথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি* [প্রস ১৯৫৪] বইয়ের পেছনের মলাটে এ-নামে ঘোষণাও দেয়া হয়েছিলো। বইটি প্রকাশের পর বইটির একটি কর্কশ অশোভন আলোচনা লিখেছিলেন সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ [*সমকাল,* ১৩৬৫, ২ঃ৩, ১৯৮-২০৩]। তিনি লেখককে তিরস্কার করেছিলেন নানাভাবে, এবং একুশ অধ্যায়ে বিভিন্ন পত্রিকার প্রচারের যে-পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে, তার ভুল ধরেছিলেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও [*উত্তরণ,* ১৩৬৫, ১ঃ২, ১৩২-১৩৫] একটি আলোচনা লিখেছিলেন বইটির, লেখককে কিছুটা প্রশংসা ক'রে সুখী করার জন্যেই অনেকটা; তবে তিনিও কয়েকটি আপত্তি তুলেছিলেন। বইটির নামই তাঁর কাছে মনে হয়েছে আপত্তিকর, যদিও আমরা আপত্তির কোনো কারণ দেখি না। *বিলেতে সাড়ে সাত'শ দিন*-এর প্রথম সংস্করণের একটি কপিতে

মুহম্মদ আবদুল হাই নিজের হাতে বইটিকে নানাভাবে সংশোধন ক'রে লিখেছিলেন 'Corrected copy for future editions-M.A. Hai, 30/8/1960'. পরবর্তী সংস্করণগুলো তাঁর এ-সংশোধন অনুসারেই ছাপা হয়, তবে তাঁর সব সংশোধন অনুসরণ করা হয় নি। সম্ভবত ছাপার সময় তিনি নিজের সংশোধন পুরোটা মানেন নি।

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডক্টর মনজুর হাসান বইটির ১৯৭০-এর মুদ্রণটিকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন; তিনি বইটিতে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন, যা, তাঁর মতে, সংশোধিত হওয়া দরকার। ত্রুটিগুলো ও তাঁর প্রস্তাবিত সংশোধন নিম্নরূপ :

পৃ ১৭ পং ২১ঃ টেম্পারেচার তিরিশ ডিগ্রি হ'লে তার নাম হয় ফ্রিজিং পয়েন্ট। শুদ্ধরূপঃ টেম্পারেচার বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট হ'লে তার নাম হয় ফ্রিজিং পয়েন্ট।

পৃ ২৬ পং ২০ঃ হালাল করা। শুদ্ধরূপ ঃ জবাই করা।

পৃ ৩১ পং ১ ঃ লন্ডনের প্রতিটি বাড়ীর নীচে আছে দু'এক তলা ঘর। মাটির নীচে ঘর নেই এমন বাড়ী তো আজও চোখে পড়লো না। শুদ্ধরূপ ঃ লন্ডনের অধিকাংশ পুরোনো বাড়ীর নীচে আছে দু'এক তলা ঘর। মাটির নীচে ঘর নেই এমন পুরোনো বাড়ী তো আজও চোখে পড়লো না।

পৃ ৩১ পং ২৩ঃ বোরো বলা হয়। শুদ্ধরূপ ঃ বারা বলা হয়।

পৃ ৪০ পং ১৬ঃ ফায়ারপ্লেসের উপরে কানেস্তারাকে বলে Mantlepiece। শুদ্ধরূপঃ ফায়ারপ্লেসের উপরে তাককে বলে Mantlepiece।

পৃ ৮৫ পং ১২ ঃ হ্যামষ্টেড ব'লে একটি ষ্টেশন আছে। মাটির নীচে সেটি আঠারো তলা। শুদ্ধরূপ ঃ হ্যামষ্টেড আসলে মাটির নিচে আঠারো তলা নয়।

পৃ ১০২ পং ৮ ঃ অতিরিক্ত দু'হাজার ট্রেন। শুদ্ধরূপ ঃ সম্ভবত হবে অতিরিক্ত দু শো ট্রেন।

পৃ ১০২ পং ১০ ঃ প্রতিদিন আট হাজার অতিরিক্ত বাস। শুদ্ধরূপ ঃ সম্ভবত হবে প্রতিদিন আট শো অতিরিক্ত বাস।

পৃ ১৬২-১৬৩ ঃ পত্রিকাগুলোর প্রচারের যে-পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তা যথাযথ নয়।

পৃ ১৭৩ পং ১২ ঃ আগ্নেয়াস্ত্র আর আগুনের খেলায় দেখছি লন্ডন শহর যেন মেতে উঠেছে। শুদ্ধরূপ ঃ আগুনের খেলায় দেখছি লন্ডন শহর যেন মেতে উঠেছে।

বিলেতের সাড়ে সাত শ দিন-এর অধ্যায়গুলো বিভিন্ন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রকাশের তথ্য নিম্নরূপ :

১৯৫২　ইংরেজ জীবন ও চরিত্র। *মিল্লাত,* ৮ জুন ও ১৫ জুন।
১৯৫৩　ইংরেজ জীবন ও চরিত্র। *মিল্লাত,* ৮ জুন।
১৯৫৩　পথ চলতে। *সংবাদ,* ১৪ আগস্ট।
১৯৫৩　রিজেন্ট পার্কের চিড়িয়াখানা। *সংবাদ,* অগ্রহায়ণ।
১৯৫৩　ওকিং মসজিদ। *সংবাদ,* নভেম্বর।
১৯৫৩　বিলেতের বড় দিন। *আজাদ,* ডিসেম্বর।
১৯৫৪　বিলেতের শিশু। *আজাদ,* ১০ জানুয়ারি।
১৯৫৪　শিশুজগত ও বিলেত। *আজাদ* ,২৬ জানুয়ারি।
১৯৫৪　প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও বিলেত। *আজাদ,* ৩১ জানুয়ারি।
১৯৫৪　বিলেতের শীত। *আজাদ,* ১১ এপ্রিল।
১৯৫৪　বিলেত ও বিলেতের মানুষ। *আজাদ,* মে।
১৯৫৪　বিলেতের বসন্ত কাল। *আজাদ,* মে।

[৫] তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৫৯; গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৮+২১০; মূল্য ৪.৫০। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৯; স্টুডেন্ট ওয়েজ. ঢাকা। উৎসর্গ ঃ তোমাকে। প্রবন্ধগুলোর প্রথম প্রকাশের তথ্য :

১৯৪০　শিলংএ মে মাস। *মুসলিম হল বার্ষিকী।*
১৩৫১　ওস্তাদজী [জন গল্‌স্‌ওয়ার্দির 'ultima thule' গল্পের ছায়াবলম্বনে]। *মাসো.* ১৮ঃ৪, ১০৯-১১৪। গল্পটি মুহম্মদ আবুদল হাই সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের 'প্রাক্তন ছাত্রদের লেখা গল্পের সংকলন' *গল্পবিচিত্রায়* [প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৭০, ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা] সংকলিত হয়, ২৬৫-২৮২।
১৯৪৫　সাহিত্যিকের জবানবন্দী। *মামো,* ১৯ঃ৩, ২৪২-২৪৩।
১৯৪৬　যুগস্রষ্টা জিন্নাহ। *মামো,* পৌষ।
১৯৪৬　কৈফিয়ৎ। *মামো,* অগ্রহায়ণ, ১০৮-১০৯।
১৯৪৬　ওরা ও আমরা। *মামো,* চৈত্র।
১৯৪৭　সামনের মাস। *আজাদ,* ১৩ জুলাই।
১৯৪৭　এই জিন্দেগীর ঈদ। *জিন্দেগী,* ঈদসংখ্যা।
১৩৫৪　রস। *নয়াজামানা,* ২০ চৈত্র।

১৯৪৭ মহাভয় মহৎগুণ। *মাসো,* শ্রাবণ।

১৯৪৭ বেসুর। *মাসো,* আশ্বিন।

১৯৪৯ সুন্দরের নিমন্ত্রণ। *ঢাকা প্রকাশ,* ১২ আষাঢ়।

১৯৪৯ সুন্দর লোকে। *ঢাকা প্রকাশ,* ১ শ্রাবণ।

১৯৫২-৫৩ কথা শেখা। *মুসলিম হল বার্ষিকী।*

১৯৫৪ সুভাষণ [পত্রিকায় নাম 'ভাষা ও সুভাষণ']। *মান,* ৬ঃ৫, ১৯-২১।

১৩৬১ ভেলুয়া সুন্দরী ও আবু সওদাগর। *বর্ষলিপি।*

? তিস্তা। *নদী পরিক্রমা।*

? সুরমা। *নদী পরিক্রমা।*

১৯৫৪ ভাষার কথা। *এলান,* ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় পক্ষ।

১৩৬৩ ভাষা ও ব্যক্তিত্ব। *শিক্ষাপরিচয়,* ২য় সংখ্যা।

১৩৬৪ তোষামোদের ভাষা। *সমকাল,* ফাল্গুন-চৈত্র।

১৩৬৫ রাজনীতির ভাষা। *সমকাল,* জ্যৈষ্ঠ।

১৯৫৮ ধ্বনির ব্যবহার। *ইত্তেফাক,* ঈদসংখ্যা।

[৬] ভাষা ও সাহিত্য

প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৬৬ঃ মার্চ ১৯৬০; ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা। দ্বিতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৭০; ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৮+২৭২; মূল্য ৬.০০। উৎসর্গঃ মায়ের হাতে দিলাম। *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* থেকে এ-বইতে পুনর্মুদ্রিত হয় 'ভাষা ও সমাজ-জীবন' প্রবন্ধটি।

যে-প্রবন্ধগুলোর প্রথম প্রকাশের তথ্য পাওয়া গেছে, তা নিচে দেয়া হলো :

১৯৪৯ পাকিস্তানের জাতীয় কবি ইকবাল। *মান,* আগস্ট।

১৯৫০ উর্দু কবিতার জন্মকথা ও কবি হালী। *মান,* ১ঃ১০, ৪৪-৪৯।

১৯৫০ গিরিশ ঘোষ, ডি, এল, রায় ও ক্ষিরোদ প্রসাদ। *দ্যুতি,* ফেব্রুয়ারি।

১৯৫২ মৈমনসিংহ গীতিকা। *এলান,* জানুয়ারি।

১৯৫৩ ভাষা ও সমাজ-জীবন। *মান,* ৫ঃ৫, ১২-১৭ । ।

১৯৫৪ ইকবালের মোমেন [পত্রিকায় নাম 'মোমেন']। *মান,* ৬ঃ১, ৮-৯।

১৯৫৪ বাংলা ভাষা ও তার পঠন-পাঠন। *দৈনিক আজাদ,* মে ২। সভাপতির ভাষণ, ভাষা ও সাহিত্য শাখা, প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন, এপ্রিল ১৯৫৪।

১৯৫৫ সীমান্তের ভাষা ও সাহিত্য। *মান*, মার্চ।
১৩৬৫ আমাদের বাংলা উচ্চারণ। *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ২ঃ১, ৩৩-৪১।
১৩৬৫ রোমান বনাম বাংলা হরফ। *সমকাল*, ২ঃ৮, ৪৬২-৪৬৯।

[৭] A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali

প্রথম সংস্করণ ১৯৬০; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা ১৮+২৪১; মূল্য ১৫.০০, বিদেশে ৪২ শিলিং। বইটির মুখবন্ধ লেখেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রফেসর এমেরিটাস জে আর ফার্থ। বইটির সূচনা ফ্ল্যাপে ছাপা হয়েছিলো নিম্ন পরিচিতি :

This book is a major contribution, in the field of Descriptive Linguistics, to the study of the Bengali Language. A pioneer work, it is "well founded in phonetics and in richness of exemplification and instance." The author has used all the techniques of the science of Linguistics and provides "impressive of the perception techniques of the observation and record at the phonetic level in the form of palatograms and kymograms or of both, specifically keyed to the analysis."

In his foreword to Mr. Hai's work, Professor J. R. Firth describes the book as "fresh and full of interest to all students of linguistics." While commending it with "great pleasure" to interested readers, he points out that, "although he has realised the importance of keeping the phonetic, phonological and grammatical levels of analysis distinct in approach and separate in treatment, he has also shown the value of a close association of his findings at the phonological and grammatical levels."

Before Mr. Hai could ever begin to write this book it was necessary for him to undertake a complete analysis of the phonetics of Bengali. Only in this way could he seize from the

stream of speech that element which is so exhaustively examined in this work. Any one who has the patience to study the new terminolgy employed by Mr. Hai will find this book a mine of information. It is by no means confined to the subject of nasality, and should be of interest to all linguists.

বইটির পেছনের ফ্ল্যাপে মুদ্রিত হয়েছিলো নিম্ন প্রশংসাবাণী :

An Opinion

Both Professor Ferguson and I were impressed with the high calibre of the work. It has a wealth of phonetic detail, and the analysis, while based on different premises than ours, offers a valuable contribution to the understanding of Bengali phonology.

Carleton T. Hodge
Head, Department of Near Eastern and African Languages
School of Languages
Foreign Service Institute
Washington

[৮] The Sound Structures of English and Bengali

প্রথম সংস্করণ ১৯৬১; বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বইটির সহযোগী লেখক W. J. Ball। বইটি পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। পৃ ১০+৯৭। মূল্যের উল্লেখ নেই। উৎসর্গঃ ডঃ মাহমুদ হুসেইন, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[৯] Traditional Culture in East Pakistan
[A survey under the auspices of UNESCO]

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৬৩; বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা ১৪+১৬৩+২৩; মূল্য ৭.৫০। এ-গ্রন্থের প্রধান ও সহযোগী লেখক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন এ-বইয়ের 'FOREWORD' ও দুটি পরিচ্ছেদ ঃ Chapter II : Folk Songs and Folk Literature, 10-99, এবং Chapter VII : Indigenous Games and Sports, 142-157.

[১০] ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৬৪ ঃ কার্তিক ১৩৭১; বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা। পৃষ্ঠা ১৮+৪০৪; মূল্য ১২.০০। দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৬৭ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪। উৎসর্গ ঃ প্রাচীন পাকিস্তানের অধিবাসী বিশ্ববিশ্রুত ধ্বনিবিদ পাণিনির অনুরক্ত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্বের পরলোকগত অধ্যাপক আমার শিক্ষাগুরু জনাব জন্ রুপার্ট ফার্থ ও পাক-ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ জীবিত ভাষাবিদদের অন্যতম জনাব ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-র উদ্দেশ্যে। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*-এর পঞ্চম অধ্যায় 'ধ্বনির অবস্থান' সম্ভবত এ-গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত হয়; অন্য অধ্যায়গুলো মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত *সাহিত্য পত্রিকায়* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রথম সংস্করণে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির পরিচয় ছিলো না, দ্বিতীয় সংস্করণে তা যোগ করা হয়। অধ্যায়গুলোর প্রথম প্রকাশের তথ্য :

১৩৬৪ তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি [*সাহিত্য পত্রিকায়* নাম ছিলো 'বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি']। *সাপ,* ১ঃ১, ৫-৩২; ১ঃ২, ২১-৫৫।
১৩৬৫ চতুর্থ অধ্যায় ঃ বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি। *সাপ,* ২ঃ১, ১-২৮।
১৩৬৫ অষ্টম অধ্যায় ঃ বাংলা স্বরধ্বনি [*সাহিত্য পত্রিকায়* ছিলো 'বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার']। *সাপ,* ২ঃ২, ১-৫০।
১৩৬৬ অষ্টম অধ্যায়ঃ ধ্বনিগুণ। *সাপ,* ৩ঃ১, ১-২৪।
১৩৬৬ ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ। *সাপ,* ৩ঃ২, ১-২০।
১৩৬৭ সপ্তম অধ্যায় ঃ বাংলা বাক-প্রবাহ [*সাহিত্য পত্রিকায়* নাম ছিলো 'বাংলা ধ্বনিপ্রবাহ']। *সাপ,* ৪ঃ১, ১-৩৬; ৪ঃ২, ১-৫০।
১৩৬৮ প্রথম অধ্যায় ঃ বাক্-প্রত্যঙ্গ। সাপ, ৫ঃ২, ১-৩০।
১৩৬৮ দশম অধ্যায় ঃ বাংলা লিপি ও বানান সমস্যা। *সাপ,* ৫ঃ২, '১-৩০।
১৩৭১ নবম অধ্যায় ঃ ধ্বনিতরঙ্গ। *সাপ,* ৮ঃ১, ১-২১।

[১১] প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণ

প্রকাশকাল নেই। গ্রীন্ বুক হাউস, ঢাকা ২। পৃষ্ঠা ৬+১২৩; মূল্য এক টাকা বারো পয়সা। বইটি ঈষ্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্স্‌টবুক বোর্ড কর্তৃক ৫-১২-৬৬ তারিখের ১৬ পি/১ বি-১৩৫/৬৫ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত।

[১২] Bengali Language Handbook

প্রথম সংস্করণ ১৯৬৬; সেন্টার ফর অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক্স, ওয়াশিংটন ডি সি। মূল্য ডলার ৩.০০। এ-বইয়ের প্রধান সহযোগী লেখক পুণ্যশ্লোক রায় ও লীলা রায়।

মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন এ-বইয়ের একটি পরিচ্ছেদ ঃ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ Dacca Dialect. বইটির মুখবন্ধে বলা হয়েছে ঃ Punya Sloka Ray is responsible for chapters 1-11, 13, and with Muhammad Abdul Hai, for part of chapter 12. তাই মুহম্মদ আবদুল হাই এ-পরিচ্ছেদটিরও অংশবিশেষ লিখেছিলেন, কিন্তু কতোটুকু তিনি লিখেছিলেন তা স্থির করা সম্ভব নয়।

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও নানাবিধ রচনা

১৯৩৬ কালো। *রাজশাহী মাদ্রাসা বার্ষিকী,* ১৩-১৮।

১৯৩৭ ঈদ মাহফেলে এক রাত্রি। *রাজশাহী মাদ্রাসা বার্ষিকী,* ১১-১৬।

১৯৩৮ আকর্ষণ। *সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকী।*

১৯৩৯ ছোটগল্প। *সোনার বাংলা,* ২৫ চৈত্র।

১৯৩৯ পল্লীসাহিত্য। *সোনার বাংলা,* ১৫ বৈশাখ।

১৯৪৪ বাংলা কাব্যের বৈশিষ্ট্য। *সওগাত,* কার্তিক।

১৩৫৬ বৃষ্টির প্রবাদ। *ফজলুল হক হল বার্ষিকী,* ৩৯-৪৬।

১৩৫৬ রবীন্দ্র-কাব্যে মানবতা। *তাহজীব,* ১ঃ৩। *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (১৯৫৪) গ্রন্থে গৃহীত ও দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত।

১৯৫০ সেকাল ও একাল। *মুক্তি,* ১৯৫০, ১০০-১০৬।

১৯৫১ বিলাতের পথে। *মাহে-নও* ৩ঃ৪, ৩২-৩৫। রচনাটির শেষে 'ক্রমশঃ' লেখা থাকলেও পরের সংখ্যাগুলোতে লেখাটি বেরোয় নি। এটি তাঁর *বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন*-এ গৃহীত হয় নি।

১৩৬০ বিদ্যাপতি ও রাধিকা। *স্পন্দন,* কার্তিক।

১৩৬০ *Birth of Pakistan* [পুস্তক সমালোচনা]। *মাহে,* ২৪ বর্ষ, কার্তিক-আশ্বিন।

১৯৫৪ ভূমিকা। আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত মীর মশাররফ হোসেনের *জমীদার দর্পণ*-এর [প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা] ভূমিকা।

১৯৫৪ ধ্বনিবিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা। *মান,* ৬ঃ৪, ৮-১১।

১৯৫৪ ধ্বনিতত্ত্ব, তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। *এলান,* ফেব্রুয়ারি।

১৯৫৪ বাংলা স্বরধ্বনির জাতিবিচার। *ফজলুল হক হল বার্ষিকী।*

১৯৫৪ একালের বুদ্ধিজীবীদের মনোবিকাশের ধারা। অনুদিত প্রবন্ধ। শেখ মোহাম্মদ ইকরাম সম্পাদিত *পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার*-এ [পাকিস্তান পাবিলিকেশন্‌স ঢাকা] সংকলিত।

১৯৫৫ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির স্বরূপ। *মান,* ৭ঃ১, ৩৫-৩৮; ৭ঃ৩, ৫১-৫৫।

১৯৫৫ ইসলামী সাহিত্য। *মান,* ৭ঃ৫, ১৪২-১৪৮।

১৯৫৫ কাসাসোল আম্বিয়া। *বাঙ্গালা পুথি সাহিত্য* [পাকিস্তান পাবিলিকেশন্‌স, ঢাকা], ৪৮-৫৪।

১৯৫৫ আলেফ লায়লা। *বাঙ্গালা পুথি সাহিত্য* [পাকিস্তান পাবিলিকেশন্‌স, ঢাকা], ৫৫-৬২।

? জীবন মহাকাব্যের প্রথম সর্গ। *সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকী।*

১৯৫৬ ভূমিকা। এ কে এম আমিনুল ইসলামের *জসীমউদ্দিন ঃ কবি ও কাব্য*-এর [ওদুদ পাবিলিকেশন্‌স, ঢাকা] ভূমিকা।

১৯৫৭ করাচীতে। মুহম্মদ আবদুল হাই প্রণীত *সাহিত্যের পথে* [প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭, সুলভ লাইব্রেরী, দিনাজপুর] নামক ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত, ৮৩-৮৬। এ-অংশটুকু *বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন*-এ রয়েছে।

১৯৫৭ বিলেতের শীত। মুহাম্মদ আবদুল হাই প্রণিত সাহিত্যের *পথে* দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭, সুলভ লাইব্রেরী, দিনাজপুর] নামক সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত, ৯৬-১০১। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের *বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন* প্রথম গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৯৫৮তে; 'বিলতের শীত' ওই বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত ও ভিন্নভাবে অনুচ্ছেদবিন্যস্ত রূপ।

১৯৫৭ পূর্ব-পাকিস্তান। মুহম্মদ আবুদল হাই প্রণীত *সাহিত্যের পথে* [প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭, সুলভ লাইব্রেরী, দিনাজপুর] নামক ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত, ১-৩।

১৩৬৪ *দিশারী* [পুস্তক সমালোচনা]। *সাপ,* ১ঃ১, ১৪৮-১৫৪।

১৯৫৮ মুখবন্ধ। জনাব আহমদ শরীফ সম্পাদিত *পুথি-পরিচিতি* [বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়] গ্রন্থের মুখবন্ধ।

১৯৫৮ *বগুড়ার ইতিকাহিনী* [পুস্তক সমালোচনা]। *মান,* ৯ঃ১২, ১৬৩।

১৯৫৮ *উপচয়ন* [পুস্তক সমালোচনা]। *মান,* ১০ঃ৬, ৫৪।

১৯৫৯ *ফুটপাত* [পুস্তক সমালোচনা]। *মান,* ১১ঃ২, ৫৪।

১৯৫৯ আমাদের অনুবাদ সাহিত্য। *মান,* ১১ঃ৩, ৩৭-৩৮।

১৯৫৯ *চাঁদের হাট* [পুস্তক সমালোচনা]। *মান,* ১১ঃ৮, ৫৩-৫৪।

১৯৫৯ বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে আরবী ও ফারসীর প্রভাব। *মান,* ১১ঃ৯, ৩১-৩৪।

১৯৬০ নজরুল প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত *নজরুল সাহিত্য*-এ সংকলিত, ৬৭-৭৫।

১৩৬৭ ভূমিকা। আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত মীর মশাররফ হোসেনের *গাজী মিয়ার বস্তানীর* [ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা] ভূমিকা।

১৯৬১ ভূমিকা ও অর্থ-সংকেত। মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত *হারামণির* (৫ম খণ্ড) ভূমিকা ও অর্থসংকেত, ২১১-২২২।

১৩৭০ ভাষণ। ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০-এ মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষণ; সংকলিত মুহম্মদ আবুদল হাই সম্পাদিত *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ* ১৩৭০ [বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়] পৃ ১৮-২৮।

১৩৭০ ভূমিকা। মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত *গল্প বিচিত্রার* (১৩৭০) ভূমিকা।

১৯৬৩ নজরুল-কাব্যে মানবতা। *নজরুল পরিচিতি* [পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা], ৪১-৪৫।

১৯৬৩ উপন্যাস রচনায় নজরুল। *নজরুল পরিচিতি* [পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা], ৯০-৯৫।

১৯৬৩ বাংলা কাব্যে নতুন ধারা ও নজরুল। *নজরুল পরিচিতি* [পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা], ১৬৫-১৬৮।

১৯৬৩ সিলেটী। *পরিক্রম*, ২ঃ৭, ৫৮৭-৫৯০।

১৯৬৪ পুঁথিসাহিত্য ও তোহফা। *মাস*, ১৫ঃ১০, ৫-৭।

১৯৬৪ ভূমিকা। গোলাম সাকলায়েনের *বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য* [পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ঢাকা] বইয়ের ভূমিকা।

১৩৭১ ভূমিকা। মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ* ১৩৭০ [বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়] গ্রন্থের ভূমিকা।

১৩৭২ ঢাকাই উপভাষা। *সাপ*, ৯ঃ১, ২৫-৩৮।

১৯৬৬ ভূমিকা। রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়ার *মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সংকলন* [বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়] গ্রন্থের ভূমিকা।

১৯৬৬ কেন পড়ি। *বই*, নভেম্বর।

১৯৬৬ মাতৃভাষা শিক্ষা। অষ্টম শ্রেণীর *ব্যাকরণ ও রচনা*। গ্রীন বুক হাউজ, ঢাকা]।

১৩৭৩ এস ওয়াজেদ আলী। *ভারতকোষ*, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ৭৫।

১৩৭৩ কায়কোবাদ। *ভারতকোষ*, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ২৭৮।

১৯৬৭　ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। *শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ*, মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ সম্পাদিত, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৮১-১৮৯।

১৯৬৭　ভূমিকা। ডঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পালের *বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ* [বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়] গ্রন্থের ভূমিকা।

১৯৬৭　পাক-ভারত যুদ্ধে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা। *আজাদ*, সেপ্টেম্বর।

১৯৬৮　ম্যাকসিম গোর্কি। *দৈনিক পাকিস্তান*, এপ্রিল ৭।

১৯৬৮　ভাটিয়ালি, সারি, ভাওয়াইয়া ও জারী গান। সৈয়দ জিল্লুর রহমান সম্পাদিত *পূর্ব পাকিস্তানের লোক-কৃষ্টি* [জুন ১৯৬৮, রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা], ৬১-৬৪।

১৯৬৮　ভূমিকা। গোলাম মুরশিদের *বৈষ্ণব পদাবলী প্রবেশক* [খান ব্রাদার্স, ঢাকা] বইয়ের ভূমিকা।

১৩৭৫　গোলাম মোস্তফা। *ভারতকোষ*, ৩য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ২১১-২১২।

১৩৭৬　ভূমিকা। হাসনা বেগমের *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান* [জিলানী পাবিলিকশেন্‌স, চট্টগ্রাম] বইয়ের ভূমিকা।

১৯৬৯　বাল্যস্মৃতি। *দৈনিক সংবাদ*, ৯ জুন।

১৯৬৯　ভূমিকা। সৈয়দ আকরম হোসেনের *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসঃ দেশ কাল ও শিল্পরূপ* [বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়] বইয়ের ভূমিকা।

১৩৮০　ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক। *নিসর্গঃ* ভাষাতত্ত্ব সংখ্যা, ২০০-২০৩।

1954　The Future Shape of the Bengali Language in East Bengal. Radio Talk, April 22.

1955　Bengali Periodicals-East Pakistan : Since Partition. Proceedings of the International P. E. N. Conference, hald at Dhaka in February. Published also in *The New Values*, April.

1955　Some Phonetic and Morphological Peculiarities of the Dacca Dialect, The Literary Scence in East Pakistan, P. E. N. Publication, 71-88.

1958　Aspiration in Standard Bengali, *Indian Linguistics*, Turner Jubilee Volume I. Language. *Encyclopaedia of Islam*, Surrey, England.

1959 The Impact of Society on Language. *Dacca University Studies,* VIII : 1 & 2, 1-9.

1963 A Study of Dacca Dialect. *Studies in Pakistani Linguistics,* 105-108.

1963 Bengali Translation of Iqbal and His Impact on Bengali Literature. *Iqbal Review,* April.

1964 A Study of Chittagong Dialect. *Studies in Pakistani Linguistics,* 17-38.

1967 Some Problems of Bengali Intonation. *Study of Sounds,* Vol III, Phonetic Society of Japan.

1967 A Study of Sylhet Dialect. *Shahidullah Presentation Volume,* Edited by A S Dil, Language Research Group of Pakistan, Lahore, 25-35.

1968 Development Since Independence. *Pakistain Observer,* Februsry 22.

1970 The Development of Bengali Since the Establishment of Pakistan. Paper presented at a conference of the Malaysian Society of Orientalists, 29 Sept-1st Oct, 1967, Published by Malaysian Society for Asian Studies, 1970. National Museum, Kualalumpur. Also in *Can Language be Planned,* Edited by Joan Rubin and Bjorn H Jernudd. East West Center and University Press of Hawaii, 1971.

সম্পাদিত ও একটি অনূদিত গ্রন্থ সম্পর্কে

নিম্ন গ্রন্থগুলোর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই। প্রতিটি গ্রন্থে সম্পাদক হিশেবে তাঁর নাম প্রচ্ছদে ও অন্যত্র ছাপা হয়েছে প্রথমে, পরে ছাপা হয়েছে সহযোগী সম্পাদকের নাম। তবে বইগুলো সম্পাদনা করেছিলেন ও ভূমিকা লিখেছিলেন সহযোগী সম্পাদকেরাই, যদিও ভূমিকায় কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। ভূমিকাগুলো নিশ্চিতভাবেই মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের লেখা নয়।

১৯৬১ *মধ্যযুগের বাংলা গীতি কবিতা।* ডঃ আহমদ শরীফ সহযোগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৬৭ *কালকেতু উপাখ্যান।* আনোয়ার পাশা সহযোগে। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১৯৬৭　*মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান* / আনোয়ার পাশা সহযোগে। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১৩৭৪　*বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*। আনোয়ার পাশা সহযোগে। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১৩৭৫　*চর্যাগীতিকা* / জনাব আনোয়ার পাশা সহযোগে। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৭৩; বর্ণমিছিল ঢাকা।

১৯৬৮　*সাজাহান* / ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সহযোগে। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

১৯৬৮　*দীনবন্ধু-রচনাসংগ্রহ* / ডঃ আনিসুজ্জামান সহযোগে। স্টুডেন্ট, ওয়েজ, ঢাকা।

১৯৬৮　*বিদ্যাসাগর-রচনাসংগ্রহ* / ডঃ আনিসুজ্জামান সহযোগে। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১৩৭৬　*ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ*। জনাব আনোয়ার পাশা সহযোগে। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

১৯৬৮　*প্রাকৃত প্রবেশিকা* / অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মুহম্মদ আবুদল হাই ও পি আর বড়ুয়া [বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]। এ-বইটির ভূমিকা মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের নামে মুদ্রিত কিন্তু বইটি নিশ্চিতভাবে অধ্যাপক বড়ুয়ার অনুবাদ।

1959 The Impact of Society on Language. *Dacca University Studies,* VIII : 1 & 2, 1-9.

1963 A Study of Dacca Dialect. *Studies in Pakistani Linguistics,* 105-108.

1963 Bengali Translation of Iqbal and His Impact on Bengali Literature. *Iqbal Review,* April.

1964 A Study of Chittagong Dialect. *Studies in Pakistani Linguistics,* 17-38.

1967 Some Problems of Bengali Intonation. *Study of Sounds,* Vol III, Phonetic Society of Japan.

1967 A Study of Sylhet Dialect. *Shahidullah Presentation Volume,* Edited by A S Dil, Language Research Group of Pakistan, Lahore, 25-35.

1968 Development Since Independence. *Pakistain Observer,* Februsry 22.

1970 The Development of Bengali Since the Establishment of Pakistan. Paper presented at a conference of the Malaysian Society of Orientalists, 29 Sept-1st Oct, 1967, Published by Malaysian Society for Asian Studies, 1970. National Museum, Kualalumpur. Also in *Can Language be Planned,* Edited by Joan Rubin and Bjorn H Jernudd. East West Center and University Press of Hawaii, 1971.

সম্পাদিত ও একটি অনুদিত গ্রন্থ সম্পর্কে

নিম্ন গ্রন্থগুলোর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই। প্রতিটি গ্রন্থে সম্পাদক হিশেবে তাঁর নাম প্রচ্ছদে ও অন্যত্র ছাপা হয়েছে প্রথমে, পরে ছাপা হয়েছে সহযোগী সম্পাদকের নাম। তবে বইগুলো সম্পাদনা করেছিলেন ও ভূমিকা লিখেছিলেন সহযোগী সম্পাদকেরাই, যদিও ভূমিকায় কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। ভূমিকাগুলো নিশ্চিতভাবেই মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের লেখা নয়।

১৯৬১ *মধ্যযুগের বাংলা গীতি কবিতা।* ডঃ আহমদ শরীফ সহযোগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৬৭ *কালকেতু উপাখ্যান।* আনোয়ার পাশা সহযোগে। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১৯৬৭ *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান* । আনোয়ার পাশা সহযোগে। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১৩৭৪ *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*। আনোয়ার পাশা সহযোগে। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১৩৭৫ *চর্যাগীতিকা* । জনাব আনোয়ার পাশা সহযোগে। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৭৩; বর্ণমিছিল ঢাকা।

১৯৬৮ *সাজাহান* । ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সহযোগে। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

১৯৬৮ *দীনবন্ধু-রচনাসংগ্রহ* । ডঃ আনিসুজ্জামান সহযোগে। স্টুডেন্ট, ওয়েজ, ঢাকা।

১৯৬৮ *বিদ্যাসাগর-রচনাসংগ্রহ* । ডঃ আনিসুজ্জামান সহযোগে। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১৩৭৬ *ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ*। জনাব আনোয়ার পাশা সহযোগে। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

১৯৬৮ *প্রাকৃত প্রবেশিকা* । অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মুহম্মদ আবুদল হাই ও পি আর বড়ুয়া [বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]। এ-বইটির ভূমিকা মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের নামে মুদ্রিত কিন্তু বইটি নিশ্চিতভাবে অধ্যাপক বড়ুয়ার অনুবাদ।